প্রমথ চৌধুরীর "আমাদের ভাষা সংকট" (সবুজপত্র-এ প্রকাশিত) প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু হলো ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলা ভাষা ও চিন্তাধারায় সৃষ্ট জটিলতা, ইংরেজি শব্দের অবাধ ব্যবহার, এবং সাহিত্যিক ভাষার কৃত্রিমতা পরিহার করে চলিত ভাষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা [১, ৩]। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে শিক্ষিত সমাজ বাংলা বলতে গিয়ে ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে ফেলছে এবং এতে ভাষার নিজস্ব রূপ সংকটে পড়ছে [১]।

প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু ও পয়েন্ট:

- **ইংরেজি ভাষার প্রভাব:** ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে নতুন জ্ঞান ও ভাব প্রকাশের জন্য ইংরেজি শব্দ বাংলায় ঢুকে পড়েছে, যা বাংলা ভাষার স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করছে [১]।
- **লৌকিক চুরি ও ভাষাসংকট:** প্রমথ চৌধুরী লৌকিক চুরি বা ইংরেজি শব্দ ধার করার বিষয়টিকে আসল ভাষা-সংকট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন [২]।
- **শিক্ষিত সমাজের দ্বিধা:** দেশের সাধারণ জনগণ ইংরেজি না জানলেও শিক্ষিত সমাজ ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে বাংলা বলছে, যা একটি নতুন ধরণের ভাষাগত সংকট [১]।
- **চলিত ভাষার পক্ষে অবস্থান:** এই সংকট দূর করতে তিনি চলতি ভাষার সহজ-সরল রূপ ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন [৩]।

মূলত, বাংলা ভাষার নিজস্ব শক্তি বজায় রাখা এবং বিদেশি শব্দের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করাই ছিল এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

প্রমথ চৌধুরীর "আমাদের ভাষা-সংকট" প্রবন্ধ অনুযায়ী, ইংরেজি মিশ্রিত 'সংকর' ভাষার ব্যবহারই প্রধান সংকট, যার মুক্তির উপায় হলো ভাষার স্বকীয়তা বজায় রাখা, নিজস্ব সাহিত্যচর্চা বৃদ্ধি, কথ্য ও লেখ্য রূপের মধ্যে ব্যবধান কমানো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বাংলা শব্দের পরিমিত প্রয়োগ নিশ্চিত করা [১, ৩]।
প্রবন্ধ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বাংলা ভাষার সংকট মুক্তির উপায়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

- **নিজস্ব ভাষার প্রতি আত্মবিশ্বাস:** ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলা ভাষার সাথে ইংরেজি মেশানোর প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই 'সংকর' ভাষা ব্যবহার বন্ধ করে শুদ্ধ বা পরিমিত বাংলা ব্যবহারের মানসিকতা তৈরি করতে হবে [১]।
- **চলিত ভাষার চর্চা:** প্রমথ চৌধুরী চলিত ভাষাকেই প্রাণের ভাষা মনে করতেন। কথ্য ও লেখ্য রূপের দূরত্ব কমিয়ে চলিত ভাষার ব্যবহার সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে ভাষা স্বাচ্ছন্দ্য পায় [১]।
- **শব্দভা-ারের ব্যবহার:** সংস্কৃত বা ইংরেজি শব্দের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা না করে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার, বিশেষ করে চলিত ও দেশি শব্দের ব্যবহার বাড়াতে হবে [১০]।

- **শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্ব:** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের উচিত ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহিত করা। মা-মাসিদের মুখে বাংলা শোনা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি বাংলা বলা ও লেখাটাও স্বাভাবিক রাখতে হবে [১০]।

- **নতুন শব্দের আত্মীকরণ:** বহতা নদীর মতো ভাষা নতুন শব্দ গ্রহণ করে, তবে তা যেন নিজের অস্তিত্বকে বা বাংলা ভাষার নিজস্ব সৌন্দর্যকে গ্রাস না করে, সেদিকে খেয়াল রেখে বিদেশি শব্দ বর্জন বা প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করতে হবে [১১]।

সংক্ষেপে, নিজের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতাই এই সংকট থেকে মুক্তির মূল চাবিকাঠি।
প্রমথ চৌধুরী (ছদ্মনাম 'বীরবল') বাংলা সাহিত্যে মূলত মননশীল, চলিত ভাষারীতি ও বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধের প্রবর্তক [৭, ৮]। তাঁর প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু সাহিত্য, শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতির বিশ্লেষণ, যা বুদ্ধিদীপ্ত, তীক্ষ্ণ ও ঘরোয়া ভঙ্গিতে লেখা [২, ৪]। 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি চলিত গদ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং যুক্তি দিয়ে কুসংস্কার ও প্রচলিত মতবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন [৪, ৬]।
প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধের প্রধান বিষয়সমূহ:
- **সাহিত্য ও ভাষাদর্শ:** তিনি বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক। ভাষা, সাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা, এবং ফরাসি সাহিত্যের প্রভাব তাঁর রচনার অন্যতম প্রধান বিষয়।

- **শিক্ষানীতি:** তাঁর 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে প্রচলিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং প্রকৃত জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

- **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ:** প্রাক-আধুনিক মানসিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপাত্মক (Satirical) ভঙ্গিতে প্রবন্ধ রচনা করেছেন

- **রাজনীতি ও ইতিহাস:** সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, এবং সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত

- **রচনাবলী:** তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে 'তেল-নুন-লাকড়ি' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা কথা' (১৯১৯), 'আমাদের শিক্ষা' (১৯২০), ও 'রায়তের কথা' (১৯২৬) অন্যতম [১, ১৩]।

তাঁর প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো, "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" পর্যন্ত সবকিছুই বুদ্ধির ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা

১.১ ভূমিকা

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর রবীন্দ্রযুগে বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী লেখক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। তিনি 'বীরবল' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। সবিশেষ খ্যাত ছিলেন যুগান্তকারী সাহিত্য সাময়িকী সবুজপত্র (১৯১৪)-এর সম্পাদক হিসেবে। তাঁর খ্যাতির অন্যতম কারণ 'বীরবলী গদ্য স্টাইল' এবং বয়োকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও 'রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাববিস্তার'।

মনীষীপ্রতিম প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যভাবনা ও ভাষাদর্শ পর্যবেক্ষণ ও পুনর্মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা সমালোচনাকর্মের অন্তর্গত প্রয়োজনেই সম্পন্ন হতে পারে। প্রতিটি যুগে অতীতের সাহিত্যিক ও সাহিত্যকর্মের পুনর্মূল্যায়ন মানবীয় চিন্তা-গবেষণা-আলোচনা-সমালোচনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। টি এস এলিয়ট বলেন, From time to time, every hundred years or so, it is desirable that some critic shall appear to review the past of our literature and set the poets and the poems in a new order. This task is not one of revolution but of readjustment.

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৬৮) সংকলনে সাহিত্য ও ভাষার কথা, ভারতবর্ষ, সমাজ ও বিচিত্র শিরোনামে অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে সাহিত্য ও ভাষার

কথাবিষয়ক প্রবন্ধগুচ্ছের ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যভাবনা ও ভাষাদর্শের বৈশিষ্ট্য আলোচনা এ-প্রবন্ধের মৌল প্রতিপাদ্য।

১.২

সাহিত্য-সাধনার কালগত পরিধি বিচারে প্রমথ চৌধুরীর রচনাসম্ভার সুবিশাল নয়। তবে তাঁর রচনাসম্ভার বিষয়বৈচিত্র্যে বিপুল। 'জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর আলোচনা থেকে। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম হলেও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ ও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক অনেকে রচনা করেছেন। সেই সব প্রবন্ধ ও পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য – বুদ্ধদেব বসুর প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য (১৯৩৮), প্রমথ চৌধুরী (১৯৪৬); ভূদেব চৌধুরীর গদ্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরী; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরবলী গল্প; নীলরতন সেনের প্রমথ চৌধুরী : সাহিত্য প্রবন্ধ প্রসঙ্গ; অতুলচন্দ্র গুপ্তের প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ; দিলীপকুমারের প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র; মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের প্রমথ চৌধুরী : বাংলা ভাষা ও গদ্যচিন্তা এবং অধ্যাপক আহমদ কবির-রচিত প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচিন্তা প্রভৃতি। পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের মধ্যে জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের প্রমথ চৌধুরী (১৯৫৪), রথীন্দ্রনাথ রায়ের বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী (১৯৫৮), অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বীরবল ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬০) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. ক্ষেত্রগুপ্ত, মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান এবং কাজী দীন মুহম্মদ ও ড. সাইদউর রহমান রচিত সাহিত্য সংস্কৃতির উদার প্রান্তরে (ঢাকা, ২০০২) প্রমুখ প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচিন্তা ও ভাষাবোধের উপর আলোকপাত করেন। ওই আলোচকবৃন্দের মন্তব্যে ও বক্তব্যে বিশ শতকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান স্বীকৃত ও অবস্থান নির্ণীত হয়ে গেছে উত্তমরূপে। তথাপি একজন মনস্বী মনীষী প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিকর্ম (টেক্সট) সমকালীন যুগের উদীয়মান ভাবনাসূত্রযোগে পাঠ করার অবকাশ থেকে যায়। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সাল থেকে 'বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য' নামে যে নতুন যুগবিভাগ শুরু হয়, তাতে বাঙালির স্বাধীন জাতিসত্তা বিনির্মাণে অতীতের ভাবসম্পদ বিরাঁ উদ্দীপক শক্তি। প্রাতঃস্মরণীয় সুসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী আমাদের আত্মগত মননজীবনের ভাব ও ভাষাসম্পদে শ্রীবৃদ্ধিকরণে
অবশ্য-অধ্যয়ন ও অনুধাবনের বিষয়। স্বাধীন জাতির সৃজনশীল ও মননশীল চিন্তারীতি সমৃদ্ধিকল্পে প্রমথ চৌধুরীর
সাহিত্য-ভাবনা ও ভাষারীতি পর্যালোচনা একটি প্রয়োজনীয় কাজ।

১.৩

নিজের লেখক সত্তার পরিচয় প্রদান করতে প্রমথ চৌধুরী সম্রাট আকবরের সভাসদ বীরবলের নামটি ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিক চরিত্র এই বীরবলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, পরিহাস নৈপুণ্য, প্রখর কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠা প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচর্চায় প্রতিফলিত হয়। বাংলা সাহিত্যে এসব গুণের সন্নিবেশ যিনি ঘটিয়েছেন তিনিই 'বীরবল' ওরফে প্রমথ চৌধুরী। এটুকু হলো তাঁর বীরবল ছদ্মনাম গ্রহণের তাৎপর্য। প্রমথ চৌধুরীর জন্ম যশোরে, বেড়ে ওঠেন কৃষ্ণনগরে। বিদ্যার্জন উপলক্ষে তাঁর যৌবন কাটে

কলকাতা ও বিলেতে। বার্ধক্য কেটেছে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে। তাঁর ব্যাপারে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তিনি আসলে পূর্ব বা পশ্চিম কোন বঙ্গের লোক ছিলেন না। তিনি বিদ্যানগরের বিদগ্ধ নাগরিক ছিলেন। রানী ভিক্টোরিয়া-শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের প্রজা নন, কালিদাসের উজ্জয়িনী ও পেরিক্লিস এর এথেন্স নগরের তিনি বাসিন্দা। একাল ও সেকালের জ্ঞানরাজ্যে তাঁর অবাধ ভ্রমণের ছাড়পত্র ছিলো। তিনি রাজলেখক।'

১.৪ স্বকীয়তার উৎস

প্রমথ চৌধুরীর লেখক সত্তার অন্তর্গূঢ় স্বভাবে সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। লিটারারি ট্র্যাডিশন তাঁর চেতনায় ভারতচন্দ্রের নাগরিক বৈদগ্ধ্যতা অপরোক্ষ অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। দৈবগুণে তিনি সুসাহিত্যিক নন, প্রচণ্ড তারুণ্যদীপ্ত সাধনায় তিনি স্বশিক্ষিত মনীষী। সেই ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে তাঁর প্রযত্নলালিত স্টাইল, যা একান্তই প্রমথীয়। সেই স্টাইলের সঙ্গে তাঁর মনোজীবনের সম্পর্কটা তাঁকে দিয়েছে বিরল গুণসমৃদ্ধ পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব। আর সে-কারণে পরবর্তীকালে অনেকের মধ্যে প্রমথীয় গদ্যরীতির অনুকরণ লক্ষ করা গেছে। তবে তাঁর পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করতে কেউই সফল হননি। এ-কথা মনে রেখে বুদ্ধদেব বসু বলেন, 'আর তাঁর অভিনন্দন ধ্বনিত হোক বাঙালি লেখক সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে; কারণ তিনি লেখকদের লেখক। এই দুর্ভাগা দেশের মূঢ় সমাজে আজও তিনি অপুরস্কৃত। কিন্তু যতদিন যাবে, ততই ফুটবে তাঁর রচনার দীপ্তি। ভবিষ্যৎ বাঙালি লেখকদের তিনি হবেন অন্যতম শিক্ষক। খাবার ঘরে তার ডাক পড়বে দেরিতে, কিন্তু ঘরটিতে থাকবে উজ্জ্বল আলো, তার সঙ্গীরা হবেন সংখ্যায় অল্প, কিন্তু সুনির্বাচিত। ভ্রমণের শেষে হয়তো রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদনের সঙ্গে তিনি আহারে বসবেন।'

বাংলা সাহিত্যে এই রাজকীয় উচ্চাসনের অধিকারী প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক স্বভাব ও মানস প্রবণতায় রয়েছে কৃষ্ণনগরীয় রসিকতা ও ভাষাবোধ, অভিজাত পারিবারিক ঐতিহ্য, অধ্যয়নসূত্রে ফরাসি সাহিত্যের অনুশীলন এবং ইউরোপীয় ভাবাদর্শে অবগাহন, মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব অনুসন্ধান, সংস্কৃত টীকাকারদের সঙ্গে নিজের রচনারীতি ও মেজাজের তুলনা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধনায় বাঙালিত্বের স্বরূপ অন্বেষণ। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে নানান কথার ছলে ঘুরেফিরে এগুলোই বারংবার উঠে এসেছে। তাঁর সাহিত্যিক স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছে এসব প্রবন্ধ।

বিলেতি শিক্ষা গ্রহণ করেও ইংরেজ নয়, বরং ফরাসি লেখকদের সাহিত্য ও ভাষাবোধ দ্বারা প্রমথ চৌধুরী অধিক প্রভাবিত ছিলেন। 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তার অন্যতম কারণ, 'ফরাসি লেখকদের প্রকাশের তুলনাহীন নিপুণতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে তিনি ভারতের প্রাচীন টীকাকারদের দ্বারাও প্রভাবিত হন। কেননা, টীকাকারদের যুক্তিতর্কের তীক্ষ্নতা ও সূক্ষ্মতা, বাক-নৈপুণ্য এবং শব্দ-প্রয়োগের সংহতিগুণ তাকে মুগ্ধ করেছিল। প্রাচীন যুগে নাগরিকরা কাব্যচর্চা করতেন। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা কবিদের জন্যে ছিল প্রেরণার উৎস। ফলে কাব্যের বিষয়বস্তুর চেয়ে বিষয় উপস্থাপন কৌশলের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি। অর্থাৎ কনটেন্ট নয়, ফর্মই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে দেখতে পাই, কবি কী বললেন, তার চাইতে কীভাবে বললেন

তার মর্যাদা ঢের বেশি।'[৫] এই সূত্রে, রচনার বিষয় নয়, মুখ্য প্রমথ চৌধুরীর কাছে। প্রমথ চৌধুরীর খ্যাতির পেছনে তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকার একটা বিশেষ অবদান রয়েছে এবং তা বাংলা ভাষার একটা বিশেষ রূপকে শক্ত কাঠামোর উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

১.৫ : প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র

১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ) ২৫শে বৈশাখ সবুজপত্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। সবুজপত্র প্রমথ চৌধুরীর অনবদ্য সৃষ্টি। এই পত্রিকার দৌলতে গড়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের 'বীরবলী যুগ' বা 'বীরবলী চক্র'। জীবনেন্দ্র সিংহ রায় বীরবলী যুগের তাৎপর্য মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন, 'কালের বিচারে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যিক। কিন্তু সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে রবিচক্রের অন্তর্গত বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক মানুষ ও অতি নিকট আত্মীয় হয়েও তাঁর সম্ভবপর প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন।' কেবল মুক্ত ছিলেন না, কোনো কোনো বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং সে-কথা রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়।

আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহবানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নতুন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারতো না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নতুন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হই নি।'[৬]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবুজপত্র পত্রিকার ভূমিকা বিবেচনা করতে চাইলে প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাধ শিকদার-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪) প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য। 'যে ভাষায় আমাদিগের কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক।' এই ঘোষণা দিয়ে মাসিক পত্রিকায় মৌখিক ভাষাকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে তুলে 'যথার্থ সাহিত্যিক রূপ' দেওয়ার প্রচেষ্টা তখন সফল হয়নি। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে ১৯১৪ সালে সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় তা যথেষ্ট সফলতা লাভ করে। 'এ কারণে 'মাসিক পত্রিকা'র চেয়ে 'সবুজপত্রে'র ভাষা-আন্দোলন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'[৭] 'তাই প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্রকে প্রায় একার্থবোধক মনে হয়।'[৮] 'সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে একটি প্রতিষ্ঠান।'[৯]

আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নক্সা কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক রূপদানের প্রাচীনতম প্রচেষ্টার নমুনা। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনি, পত্রসাহিত্য এবং বিবেকানন্দের কিছু কিছু রচনায় কথ্যভাষার সুমার্জিত রূপ ও রীতির প্রয়োগ আছে। তবে তা সর্বজনীনতা লাভ করেনি। 'সবুজপত্র অবলম্বনে কথ্যভাষার প্রতিষ্ঠা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক উদ্দাম মাত্র নয়, এর বিস্তৃতি ও প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মর্যাদাবাহী।'[১০]

‘রচনারীতি’, ‘বক্তব্য’ এবং ‘জীবনদৃষ্টি’ – এই তিনটি ক্ষেত্রেই সবুজপত্র প্রচলিত ধারা থেকে ছিল আলাদা। এই আলাদা বৈশিষ্ট্য আরো বিশিষ্টতা লাভ করে ভাষা-আন্দোলনের সারথি হয়ে। রথীন্দ্রনাথ রায় দাবি করেন যে, ‘সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের একটা মীমাংসা সবুজপত্রের মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে ওঠে।’

১.৬ সাহিত্যভাবনা

জীবন-জগৎ-সমাজ-সাহিত্য ও কাব্য-কবিতার বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলিতে। সাহিত্য কী, সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, সাহিত্যের স্বরূপ, কাব্যের স্বরূপ, কাব্যে অশ্লীলতা, ভাব ও বস্তুতান্ত্রিকতা, কলাবিদ্যা বা আর্টের গুরুত্ব, কাব্যশক্তি, মনোজীবন ও বাস্তবজগৎ, দৈহিক সৌন্দর্য, প্রেমের ধারণা, প্রাচীন সাহিত্য ও সমকালীন সাহিত্য, সমালোচকের কর্তব্য, ক্লাসিক সাহিত্য ও প্রগতিবাদী সাহিত্য, মানসিক যৌবন, বই পড়ার গুরুত্ব, প্রচলিত শিক্ষার গলদ, প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ, মনের ক্রিয়াশীলতা, জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বরূপ, ভাববাদ ও বস্তুবাদ প্রভৃতি নানান বিষয়ে আলোকপাত ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধে।

স্পষ্ট ও বিস্তৃত পরিসরে সাহিত্যের উৎস ও স্বরূপ সম্পর্কে তিনি খুব বেশি কথা বলেননি, তবে বিভিন্ন প্রবন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে সাহিত্যের উৎপত্তি, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর ‘সিরিয়াস’ অনেক বক্তব্য ছড়িয়ে আছে। সেসব কথা একত্র করলে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যচিন্তা আলোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিসকোর্স হয়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যভাবনার প্রথম কথা হলো – মন এবং আর্ট। তিনি মনোবাদী এবং নিখুঁত আর্টের অনুরাগী। সাহিত্যের উৎপত্তি মন থেকে। ‘কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। তাঁর মতে, বিশ্বমানব মনের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম, এমনকি কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতকবিতার রঙ্গভূমির স্বগতোক্তি স্বরূপেই উচ্চারিত হয়। যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে।’ (সাহিত্যে খেলা)

‘মনের জাগ্রত ভাব থেকে সকল কাব্য, সকল দর্শন, ও সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।’ এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নিয়ে তর্ক করার অবকাশ নেই। কারণ এটুকু প্রমথ চৌধুরীর শিল্পী চেতনার মূল প্রত্যয় এবং এই প্রত্যয়ের আলোকে তাঁর সৃজন-স্বভাবের পরিচয় আবিষ্কার করতে হবে। এই প্রত্যয়ের বশেই প্রমথ চৌধুরী আজীবন সাহিত্য-সাধনায় চির অতন্দ্রচেতন। ‘তীক্ষè ধারালো চিন্তার কুঠার হাতে সকল গতানুগতিকতার বিরোধিতা করে, সকল convention-এর মূল উৎপাদন করে করে এগিয়ে চলেছেন তিনি।’[১১]

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ‘সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।’ মানুষের মনের রয়েছে ব্যক্তিত্ব। সেই মানসিক ব্যক্তিত্বের ভেতর থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘মানুষের নানা চাওয়া আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার জন্যে মাছকে চাওয়া; কিন্তু তার চেয়ে বড় চাওয়া হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে

সাহিত্যের মিলন চাওয়া। এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্যে থেকে আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়া। এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে।'[১২]

জগতের বেশির ভাগ চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে মনের চাওয়া-পাওয়া। আর এই মনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক হচ্ছে জীবন ও জগতের। মানবজীবন নিরপেক্ষ কোনো কিছুর অস্তিত্ব তার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানুষের মনোজীবনকে ঘিরে সাহিত্যের শাশ্বত রূপ বিকশিত হয়। তিনি বলেন, 'মানবজীবনের সাথে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাকছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে। কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈহিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনও কথায় চিড়ে ভিজে না, কিন্তু কোনো কোনো কথায় মন ভেজে এবং এ জাতীয় কথার সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য।'[১৩] একথার পরেই তিনি বলেন যে, 'সাহিত্য জাতির খোরপোশের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না, কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।' তাঁর কাছে সাহিত্যের একটা বিশেষ উপকারিতার কথা ধরা পড়েছে। জাতির মনোবল বৃদ্ধিতে সাহিত্য সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিতে পারে। ব্যক্তিমনের জাগরণ ঘটলে জাতির মন আর নিদ্রিত থাকে না। সাহিত্য লেখকমনের বিশেষ চৈতন্যের প্রকাশ। 'যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপলে সাহিত্য হয় না।' কেননা 'সাহিত্য হচ্ছে প্রবুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ।' এবং চৈতন্য জাগ্রত হয় আর পাঁচজনের মনের পাঁচ রকমের জ্ঞানের ধাক্কায়। তিনি মনে করেন যে, 'জ্ঞানচর্চা ব্যতীত সাহিত্যের বিকাশ হয় না।' জ্ঞানই হচ্ছে কাব্যের ভিত্তি; কারণ সত্যের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। তিনি এ-ব্যাপারে যেসব দৃষ্টান্ত দেন তার সারাংশ হলো, প্রাচীন ও আধুনিক কালের প্রাথমিক পর্যায়ে গুণী শিল্পীরা নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন যেমন কালিদাস, দান্তে, মিলটন ও গ্যেটে। তাঁর দাবি, পাণ্ডিত্য কস্মিনকালেও সাহিত্যবিরোধী নয়। একটি কাব্যের ভাববস্তু বুঝতে গেলে ঐ কাব্য রচনার কাল ও সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত জানা আবশ্যক। নানান বিদ্যায় পারদর্শী না হলে কাব্যের কাব্যগত জ্ঞান-সম্পদে প্রাচুর্য আসে না এবং তার গভীরতা কিংবা স্থূলতা বোঝা সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, 'ইউরোপের দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির সঙ্গে কতকটা পরিচয় না থাকলে কোন বড়ো ইংরেজ কবি কিংবা নভেলিস্টের লেখা সম্পূর্ণ বোঝা যায় না, তার রসও আস্বাদন করা যায় না।'[১৪] নানাবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সাহিত্য-শিল্পের মর্মার্থ উপলব্ধি কষ্টসাধ্য। তিনি বলেন, 'সংস্কৃত সাহিত্যের নানা যুক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাববশত আমরা সংস্কৃত কাব্য আধো বুঝি, সংস্কৃত দর্শন ভুল বুঝি, পুরাণকে ইতিহাস বলে গণ্য করি, আর ধর্মশাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে মান্য করি।'[১৫]

১.৭ আর্টের কথা

সাহিত্য মূলত এক ধরনের জ্ঞানের চর্চা যার কোনো

জাত-কুল-বংশ বিচারের ঝামেলা নেই। সাহিত্যে যে-কোনো শাস্ত্রের জ্ঞানকে সিনথেটিক প্রসেসের মাধ্যম গ্রাহ্য করা চলে।
যে-কোনো কালকে বাক্সময় করে তোলা যায়, যে-কোনো ব্যক্তির মুখে কথা ফুটিয়ে সত্যকে দাঁড় করানোর সুযোগ দেয় কেবল সাহিত্য এবং সেখানে লেখকের স্বাধীন চিন্তার অধিকার

অক্ষুণ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা সাহিত্য একধরনের আর্ট। আর্টিস্টের চোখ বেঁধে আঁকতে বললে সে কি তুলি ও ব্রাশ ধরতে পারবে? তাই তাকে স্বাধীন মনে কাজ করতে দিতে হবে। এ-দাবি আধুনিক নয়, প্রাচীন। সাহিত্যিক একজন কবি বা কথাকোবিদ। তিনি সর্বতোভাবে একজন শিল্পী। আর্ট করতে হলে প্রয়োজন শিল্পীর কল্পনাশক্তি, তুলি এবং রং, প্রয়োজনে একটা স্থির আদর্শ। জীবন ও জগৎ বা বিশ^প্রকৃতির রহস্যজ্ঞান না নিয়ে কেউ বিরাট শিল্পী হয়েছেন তা বলা যায় না। তিনি বলেন, 'প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্য রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি।' এই কবিত্বশক্তি শিল্পীর শক্তি এবং শিল্পী ও কবি অভিন্ন সত্তার অধিকারী। প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'বিরাট মানবজীবন ও প্রকৃতি থেকে উপযুক্ত উপাদান নির্বাচন করে নিতে হয়। সেই নির্বাচিত উপাদানকে মানবলোকে ব্যক্তিগত রূপ-রস, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাক্সক্ষা মিশিয়ে নতুনভাবে সৃষ্টি করে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হয়। এক কথায় মানবজীবন ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক সত্যকে আর্টের সত্যে পরিণত করা প্রয়োজন। কেননা, বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। কোনো সুন্দরীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং ওজন যেমন এক হিসেবে সত্য, তার সৌন্দর্যও তেমনি আর এক হিসেবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁয়ার মতো পদার্থ নয় বলে সে সম্বন্ধে কোনো রূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না।'

১.৮ কাব্যকথা

কাব্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তিনি প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও কবিতা রচনায় পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। সনেটপঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা তাঁর কাব্যশক্তির দৃষ্টান্ত। কবিতার মূলে কী থাকে তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'যে অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা কবিতায় ভাব ও ভাষায় সম্পূর্ণ একীকরণ সম্পন্ন হয় তাহাই কবিতার আত্মা। এই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় রহস্যজড়িত।'১৬ কবিতা কেবল শব্দের খেলা নয়, কিংবা শুধু ভাবের উৎশৃংখল উৎসারণ নয়। ভাষা ও ভাবের সমবায়ে কবিতা। তাঁর মতে, 'বাস্তবিক কবির নিকট ভাষা ও ভাবের ভিতর কোন প্রভেদ নাই। কবিতার ভাষা ও ভাব পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। ভাব মন্দ হইলে কবিতার ভাষা কখনো সুন্দর হইতে পারে না। কবিতার ভাষা ভাবের দেহ স্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হইতে পৃথক করিতে পারা যায় না।'[১৭]

কাব্যজগতে জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যের স্থান-কাল ও কাব্যশৈলী বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী ভাব ও ভাষা, কাব্য ও কবিত্বশক্তি ইত্যাদি প্রসঙ্গে অভিমত পেশ করেন। তিনি বলেন, 'উঁচু মানের কবি নন, কালিদাসের সমকক্ষ তো ননই; জয়দেব রমণীর দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, হৃদয়ের সন্ধান করেন নাই।' জীবাত্মা-পরমাত্মা সম্পর্কীয় যে দাবি গীতগোবিন্দ সম্পর্কে করা হয় প্রমথ চৌধুরী তার কোনো প্রমাণ পাননি। 'আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোন পরিচয় নাই। আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমাদের মতো রক্ত মাংসে গঠিত মানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছে। তাহাদের প্রেমকেও স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত সাধারণ মানবপ্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি।' (জয়দেব, প্রবন্ধ সংগ্রহ)

কাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ‘যে রচনায় রসাত্মক ভাব সম্পূর্ণ অনুরূপ ভাষায় প্রকাশিত তাহাকেই আমি কাব্য বলিয়া মানি।’ তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ‘কোন একটি ক্ষুদ্র সংজ্ঞার ভেতর দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় কবিতা পুস্তক প্রবেশ করানো যায় না। দুই চারি কথায় কোন বাক্যের সমস্ত গুণ বর্ণনা করা অসম্ভব।’ তার অর্থ – বিষয়বস্তু, ভাব ও প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতি বিবেচনায় রেখে কবিতার বিশেষত্ব সন্ধান করতে হয়, নির্ণয় করতে হয় কবিতার সংজ্ঞার্থ ও সারমর্ম। একই সঙ্গে একথা স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রত্যক্ষ সকল ঘটনাগত সত্য কাব্যগত হওয়ার উপযুক্ত নয়। ‘পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে থাকে তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময় কাব্য নয়। কাব্য রচনায় প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টি। চিত্রশিল্প ও কাব্যশিল্পের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। চিত্রশিল্পে অনুকরণ বাস্তবানুগ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কবিতায় বাস্তবতাকে পুরোপুরি ধারণ করতে গেলে কবিত্ব থাকে না। কবির কুশলতাও ফুটে ওঠে না। কাব্য অনুকরণের ফসল বটে, তবে তা নিরেট অনুকরণ নয়, অনুসৃষ্টি। ক্যামেরায় যে-ছবি তোলা হয় তা ছবি এবং তার পেছনে বিজ্ঞান উপস্থিত। কিন্তু জয়নুল আবেদিনের আঁকা দুর্ভিক্ষের ছবি বা এস এম সুলতানের কৃষকের ছবি একজন অনুভূতিপ্রবণ প্রতিভাবান শিল্পীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। স্টুডিওতে আমরা ছবি তুলতে যাই দরকারি কাজের জন্যে, আর গ্যালারিতে আমরা শিল্পীদের ছবি দেখতে যাই আনন্দলাভের জন্যে। শিল্পীর অঙ্কিত ছবির ক্যানভাসে নিজের চিন্তা ও চিত্তকে অনুভব করার নাম উপভোগ করা; কবিতা পাঠ করে এমনটা হবে যদি সেই কবিতার মধ্যে কবি শিল্পী হতে পারেন। জসীমউদ্‌দীনের ‘কবর’ কবিতা পাঠ করে বহু পাঠকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। কেন? মৃত্যু আমাদের জীবনের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। আমরা দেখছি; কিন্তু আবেগ মোহিত হচ্ছি না যেভাবে ‘কবর’ কবিতা পাঠান্তে আবেগায়িত হই। ‘কবর’ কবিতার ভাষা ও ভাব আমাদের মৃত্যুর অবিসংবাদিত সত্যকে মেনে নিতে বলে এবং হৃদয়কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রমথ চৌধুরী বলেন, ‘অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না।’ তিনি আরো বলেন যে, ‘অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। পৃথিবীতে যা ঘটে তার সব বর্ণনা দিতে গেলে কাব্য হয় না, ইতিহাস হয়।’[১৮]

কবিমনে অসংখ্য ভাবের সঞ্চার হতে পারে। তবে সব ভাব ভাষারূপ পেয়ে কবিতা হয়ে ওঠে না। সুনির্বাচিত ভাব সুনির্বাচিত ভাষায় পরিব্যক্ত হলে কাব্য হতে পারে। ‘কাব্যের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাবের উদ্রেক করা।’ কাব্য পাঠে পাঠকমনে হরেকরকমের ভাবের উদ্রেক হয়। কবি পাঠকের মনোবীণার বাদক। কথা নিয়মের শাসনাধীনে থেকে কবিকে সাধনা করতে হয়। কাব্য রচনা সযত্ন লালিত কর্মপ্রয়াস যেখানে কবির বাহ্যজ্ঞান ও অনুভূতিপ্রবণ মনের সংমিশ্রণ ঘটে। ক্ষুদ্রও তখন বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়। প্রমথ চৌধুরী বলেন, ‘ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ব আছে আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভেতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার উদ্ধার সাধন করতে হলে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে হলে সাধনা আবশ্যক। এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে দেহমনকে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা।’[১৯]

১.৯ সাহিত্যের উদ্দেশ্য

সাহিত্য ও কাব্যের স্বরূপ জানা গেছে। এবার সাহিত্যের উদ্দেশ্য জানা আবশ্যক। সাহিত্য সৃজন কি নিষ্কর্মা মানুষের কাজ, নাকি এ-কাজের পেছনে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কাজ করে। এ-বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলংকারিকদের প্রণিধানযোগ্য অনেক মূল্যবান কথা আছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী স্পষ্ট বিবৃতি দেন, 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতি রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক – এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।'[২০] এটা হচ্ছে তৎকালীন সাহিত্যের পরিস্থিতি, যা তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিত। তিনি বলেন, 'সাহিত্যের আর যাই কর না কেন, পাঠকের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করো না।' তার কারণ তিনি বাতলে দেন। আজ পাঠক যে জিনিসে মুগ্ধ, আগামীকাল তার প্রতি কোনো আগ্রহই দেখাবে না। তাই সেরকম সাহিত্য করতে গেলে আখেরে সাহিত্যিকই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এ-কারণে তিনি প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে ফরমায়েশি সাহিত্য রচনায় কোনো রকম আগ্রহবোধ করতেন না।

সাহিত্য কী ধরনের ভূমিকা পালন করে? এ নিয়ে অনেকের প্রশ্ন থাকে। তিনি স্পষ্ট বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া নয়। শিক্ষক ও কবির কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিক্ষক ছাত্রকে নির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়ার জন্য জ্ঞান দান করেন। এটা তাঁর চাকরি। অন্যদিকে সাহিত্যিক বা কবির উদ্দেশ্য তার বিপরীত। 'শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের মনকে বিশে^র খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো।' 'সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না; কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উল্টো। কারণ কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপরে তার শবচ্ছেদ করা এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা।' এ-কথা বলে প্রমথ চৌধুরী জোরের সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে আরেকটা কথা ঘোষণা দেন, 'সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।' কেননা, 'সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।' আর একটা কথা হলো, 'সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়।'

১.১০ কলাকৈবল্যবাদ ও প্রমথ চৌধুরী

বিভিন্ন প্রবন্ধে আর্ট সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী অনেক কথা বলেছেন। তবে নীতিগত প্রশ্নে আর্টের উদ্দেশ্য কী হবে – পাঠককে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে আর্ট, না সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধনার্থে আর্ট – এ-ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীর অবস্থান বেশ স্পষ্ট। এছাড়া তাঁকে এক কথায় কলাকৈবল্যবাদী বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, তিনি সাহিত্য রচনায় বাস্তবানুগ বা বাস্তবতা বিচ্ছিন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব মনে করেন। তবে তিনি ভাববাদী মনোভঙ্গির পোষকতা করেন। প্রগতিবাদী সাহিত্য সমাজকল্যাণের উদ্দেশে নিবেদিত, তা মানুষের মনকে আনন্দ দিতে পারুক বা না পারুক। এমন প্রগতিবাদী সাহিত্যে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। বরং শুরু থেকেই সাহিত্যের সামাজিক গুরুত্বের চেয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির উপর তিনি জোর দেন। এছাড়া রিয়ালিজম বা বস্তুতন্ত্রবাদ – তা সাহিত্যতত্ত্ব নয়, সমাজতত্ত্ব। তিনি অসকার ওয়াইল্ড, ওয়াল্টার পিটার, ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মতো Art for art sake মতবাদের

অনুসারী। লেভ তলস্তয়, বার্নার্ড শ' ও ম্যাক্সিম গোর্কির কল্যাণবাদী চিন্তার বিপরীত প্রমথ চৌধুরী। তিনি বিশ^াসী সৌন্দর্য সৃষ্টির তত্ত্বে। তবে তিনি এ-কথা স্পষ্টত স্বীকার করেন যে, 'কোন দেশের সাহিত্যের সঙ্গে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।'[২১] 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কী' নামক প্রবন্ধে রোমান্টিসিজম ও রিয়ালিজমের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। একটা বিষয় তাঁর কাছে স্পষ্টত ধরা পড়ে যে, একমাত্র সুন্দরের চর্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন রোমান্টিকদের দোষ, সত্যের চর্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটা রিয়ালিস্টদের তেমনি দোষ। এ-কথা থেকে তাঁর সাহিত্যচিন্তার মধ্যে সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে ঐক্য বা তাল রাখার একটা প্রয়োজন ধরা পড়ে। সত্যটা রিয়ালিটি, সৌন্দর্য রোমান্টিকতা। দুটিই সাহিত্যকে মহিমাযুক্ত করে। তিনি অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ থেকে সরে আসেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বঙ্কিম প্রবন্ধ সমাজকল্যাণাদর্শে অনুপ্রাণিত; প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ নির্বিশেষে সংস্কৃতি সাধনায় নিযুক্ত। একের মূলে ভিত্তি সমষ্টিচেতনা, কল্যাণমুখিতা, আদর্শবাদিতা, ভাবোচ্ছ্বাস; অপরের ব্যক্তিচেতনা, বিশ^মানবিকতা, দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা, বুদ্ধির মুক্তি ও ভাবালুতামুক্তি। আনন্দ সৃষ্টি ও পরিবেশনই সাহিত্য সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য, চৌধুরী মহাশয়ের এ-ই সুদৃঢ় অভিমত।'[২২] রবীন্দ্র সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর গরমিল খুব প্রকট নয়। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যের পথে'র সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'খেয়ালখাতা ও সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের তুলনা করলে বিষয়বস্তুর অনেক মিল চোখে পড়ে, যদিও 'মত প্রকাশের ভাষা ও পদ্ধতির পার্থক্য অসামান্য।' সাহিত্য সাধনা দ্বারা মানবমঙ্গল সাধন ঘটে – এ-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ পোষণ করেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য সাধনাকে আনন্দদায়ক খেলার ব্যাপার বলে মনে করেন। তিনি বলেন, 'সাহিত্যের বাণী যে জজের রায় নয়, পণ্ডিতের বিচার নয়, পুরোহিতের মন্ত্র নয়, প্রভুর আদেশ নয়, গুরুর উপদেশ নয়, বক্তার বক্তৃতা নয়, এডিটরের আপ্তবাক্য নয় – এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে লেখকের আর মুক্তি নেই। সরস্বতীকে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করার জন্যে যতদূর শিক্ষা বাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার আমি আজও ততদূর হতে পারিনি।' ('সাহিত্যে খেলা')

সমাজের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে সাহিত্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। মুক্তমনের জন্য তা কাম্য নয়। তিনি বলেন, 'একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকল প্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ¦ালোনো হোন না কেন, তাহার আলোক চারদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। … মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম।'

পূর্ব-পশ্চিম ও অতীত-বর্তমান যে-দিকের কথাই তিনি বলুন না কেন, তাঁর কাছে (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে) 'আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এ কারণে যে তিনি সাহিত্যচর্চাকে জীবনের সকল কর্মের উপর ঠাঁই দিয়েছেন এবং সাহিত্য মনের মুক্তি, একথা খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। সাহিত্যচর্চা বা কাব্যচর্চা একটি প্রথা যা সভ্যতার প্রধান অঙ্গ এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে বিচিত্র রকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কাব্যচর্চা বা সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হলো বইপড়া। তাঁর পর্যবেক্ষণ, কোন জাতি কস্মিনকালে তার দিকে (সাহিত্যচর্চা) পিঠ

ফেরায় নি। বরং যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বইপড়ে সেই জাতি যে তত সভ্য এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না।'[২৩]

তিনি কবিতা লিখেছেন; কিন্তু তাঁকে আমরা বড় কবি হিসেবে আলোচনার বিষয়বস্তু করি না। তিনি সাহিত্যচর্চায় বরাবর ভাববাদের পক্ষ নিলেও আবেগহীন জ্ঞানপিপাসু তাত্ত্বিক এবং কলাকৈবল্যবাদী। এক কথায় তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যচিন্তক। অধ্যাপক আহমদ কবির তাঁর 'প্রমথ চৌধুরী সাহিত্য চিন্তা' প্রবন্ধে বলেন, 'তিনি সর্বদা আর্ট ও মূর্তির কথা বলেন, মনের বেদিতে তিনি একটি মূর্তি স্থাপন করে নেন এবং তাতে শিল্পীর তপস্যায় নিবেদিত হন।'

১.১১. আলংকারিক প্রমথ চৌধুরী

সুবোধ সেনগুপ্ত বলেন, 'প্রমথ চৌধুরী একজন প্রকৃত আলংকারিক।' এ-রায় অসমর্থন করার কিছু নেই। বরং বলতে হয়, সামান্য লিখেই তিনি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন পরবর্তীদের উপর এবং একটি ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে তাঁকে কেন্দ্র করে। তিনি প্রাচীনকালের অভিনবগুপ্ত এবং পাশ্চাত্যের অ্যারিস্টটল উভয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। তবে 'কাব্যের গুণাগুণ বিশ্লেষণে তিনি প্রাচীনপন্থী রসবাদী আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের অনুগামী।' সাহিত্যে রুচি ও রীতি দুটি আলাদা জিনিস। ভারতচন্দ্র রীতির জন্য তাঁর কাছে শ্রদ্ধাস্পদ। কিন্তু তিনি আধুনিকদের সম্পর্কে ছিলেন নিশ্চুপ এবং রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারেও মুখ খোলেননি। অধ্যাপক আহমদ কবির বলেন, 'একখানা স্বতন্ত্র অলংকার শাস্ত্র না লিখেও প্রমথ চৌধুরী একজন আলংকারিক। বিভিন্ন প্রবন্ধে, যা তর্ক-বিতর্কে রচিত কাব্যের রূপ ও আত্মার স্বরূপ সনাক্তকরণে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেন তাতে আধুনিক কালে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে স্বনির্ভর একজন আলংকারিকের অভিধা পান।'

অন্যবিধ প্রসঙ্গ : শিক্ষা ভাবনা

প্রমথ চৌধুরী সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেন তাঁর নানা প্রবন্ধে। একটা সমাজে বিকশিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই সাহিত্য-শিল্পের অগ্রগতি। শতবর্ষ আগে বাংলাদেশে যে ব্রিটিশ ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেখানেও তিনি প্রচুর গলদ দেখতে পেয়েছেন এবং তার সমালোচনা করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে – 'মাস্টার মশায়েরা নোট দেন, ছেলেরা সেই নোট মুখস্থ করে পাস হয়।' নোট গলাধঃকরণ করে পরীক্ষার হলে উদ্গিরণ করে পাশ করলে বাহবা যতই দেওয়া হোক তাতে কাজ হয় না। তাঁর মন্তব্য, 'মনে যেন না ভাবে যে এতে জাতির প্রাণশক্তি বাড়ছে।'[২৪]

রবীন্দ্রনাথ নিজে, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ড. লুৎফর রহমান এবং কাজী মোতাহের হোসেন প্রমুখ সেই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর সমাজচিন্তার মধ্যে বিশেষ স্থান করে আছে।

প্রকৃতির ছায়াতলে প্রকৃতির নিয়মে অকৃত্রিম মমতাযোগে শিক্ষাদান ও গ্রহণের তাৎপর্য রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শনের অন্যতম বিষয়। প্রমথ চৌধুরী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যায়ের চেয়ে লাইব্রেরির স্থান উপরে বলে সাব্যস্ত করেন। হাসপাতালে যদি রোগীর দৈহিক রোগযন্ত্রণার

সেবা হয়, তাহলে মনের রোগবালাই নিরাময়ের স্থান লাইব্রেরি। লাইব্রেরি মনের চিকিৎসালয়। স্বশিক্ষিত লোকেরা সুশিক্ষিত হন লাইব্রেরির কল্যাণে। তাঁর অভিমত, 'স্কুল কলেজ বর্তমানে আমাদের যে অপকার করছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্যে শুধু নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য।'[২৫]

সাহিত্যসাধনা মানুষের নৈতিক-মানবিক চেতনাস্তরকে উন্নত করে, আত্মার তেজশক্তি বৃদ্ধি করে এবং এই সাহিত্য সাধনার অন্যতম উপায় বইপড়া। বইয়ের সংগ্রহশালা হচ্ছে লাইব্রেরি। তাই লাইরেরির প্রয়োজনীয়তা জাতির মানসগঠন ও গড়নে অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, 'আমাদের বই পড়তেই হবে; কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ন্তর নাই।' তাঁর মতে, লাইব্রেরির সংশ্রবহীন সমাজমন জড়পদার্থের শামিল। তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে, 'এদেশে দেহের মৃত্যুর রেজিস্টার রাখা হয়, আত্মার হয় না।' অথচ আত্মার মৃত্যুই মর্মান্তিক। বেশি শিক্ষার্থী পাশ করলে শিক্ষার বিস্তার ঘটছে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাঁর মতে, 'পাশ করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দেন। মহাবিপর্যয়ের দিনে ফ্রান্সকে ফ্রান্সের অলসরাই বাঁচিয়েছিলেন। অর্থাৎ যাঁরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছেড়েছেন বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন তাঁরাই কূলহারা ফরাসি জাতিকে কূল দেখিয়েছেন।

তিনি বাঙালি জাতির সম্ভাব্য আদর্শের স্বরূপ বাত্‌লে দেন। তিনি বলেন, 'আমার মতে এ যুগে বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা; কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে।' ব্রিটিশ ভারতে বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার গতিই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল এবং বাংলার রেনেসাঁস বলতে যে সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত পরিসরে জ্ঞানের নানান শাখায় সমাজ বিপ্লব ঘটেছিল তার মহিমা অখণ্ড ভারতীয় সভ্যতায় কখনো বিলীন হওয়ার মতো নয়। রোমানরা রোমীয় সভ্যতার বিস্তারণ ঘটালেও তার অন্তর্গত সত্যে নিহিত ছিল গ্রিক সভ্যতার নির্যাস। তেমনি ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে যারাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নেতৃত্ব দিতে আসুক, বাঙালি জাতির অবস্থান হবে প্রাতঃস্মরণীয়। প্রমথ চৌধুরীর এমন আশাবাদ অমূলক ছিল না। তিনি অনুধাবন করেন, 'গ্রীক সভ্যতা সামাজিক জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক। সেই কারণেই গ্রীক সাহিত্য এত অপূর্ব, এত অনন্য।' সেই সাহিত্যে আত্মার সঙ্গে আর্টের কোনো বিভেদ নেই। তিনি লক্ষ করেন, 'রাজনৈতিক কর্মীর দল বাংলায় ডেমোক্রাসি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন; তেমনি আর এক দিকে, আমাদের পক্ষে মনের অ্যারিস্টোক্রাসি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা কর্তব্য।' সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে দেশের কল্যাণ লাভ করতে হলে গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মিলন বা যৌথ প্রয়াস আবশ্যক।

পুনশ্চ, আসা যাক সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার সম্পর্ক বিষয়ে। বিদ্বান ব্যক্তিরাই সাহিত্যচর্চা করেন এবং তাঁদের চর্চায় শৈল্পিক মাত্রা জ্ঞান থাকে। তিনি স্পষ্ট বলেন, 'বিদ্যার সহিত সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্যসমাজে আদৃত হতে পারে না। যে কথা বিনা পরীক্ষায় ডাবল প্রমোশন পায়, সে-কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না।' কলকাতাকেন্দ্রিক উদ্ভিদ্যমান মধ্যবৃত্তের দ্বারা যে আধুনিকতার সূচনা ঘটে উনিশ শতকে তার মহিমা তরঙ্গায়িত

হয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎকে এখনো নাড়িয়ে যাচ্ছে। সেই আধুনিকতার উৎস তথাকথিত বঙ্গ সমাজ হতে পারে; কিন্তু তাদের জ্ঞানচর্চা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সংস্পর্শে অনন্যতা লাভ করেছিল এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই। বিদ্বানের সাহিত্যবোধ ও অশিক্ষিতদের সাহিত্যবোধ তুল্য নয়। যথাযথ বিদ্যাচর্চা বা শিক্ষার অভাব হেতু জাতির অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। তাঁর অনুধাবন, বাঙালি জাতির হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে তেজ আছে, তবে যে আমাদের সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি বঞ্চিত তাহার জন্যে দোষী আমাদের নব শিক্ষা। তবে এ-কথাও অনেকে স্বীকার করবেন যে, অনেক রকম গলদ থাকা সত্ত্বেও নবশিক্ষার দ্বারাই জানা গেছে, সাহিত্যের অনন্য ভূমিকার কথা। তিনি বলেন, 'আমাদের নবশিক্ষার প্রসাদে আমরা জানি যে সাহিত্য জাতীয় জীবন গঠনের সর্ব প্রধান উপায়; কেননা সে জীবন মানবসমাজের মনের ভেতর হইতে গড়িয়া ওঠে। … যে মনের ভেতর জীবনী শক্তি আছে তাহার স্পর্শেই অপরের মন প্রাণ লাভ করে এবং মানুষ একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র।'[২৬]

ইউরোপ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষ অন্তর্গত বাঙালি জাতির মন ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ইউরোপীয় মন ও মননের তুলনা করে প্রমথ চৌধুরী দেখাতে চেয়েছেন একটা বিশেষ পার্থক্য, বোঝাতে চেয়েছেন পার্থক্যের কারণ এবং নির্দেশ করতে চেয়েছেন আত্মজাগরণের প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদির উৎস। ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শনের সংস্পর্শে না এলে ভারতীয় মন আত্মবিস্মৃত থেকে যেত। বাংলার নবজাগরণ ইউরোপীয় নবজাগরণের উনিশ শতকীয় বাঙালি সংস্করণ।

'ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃত-ই হোক, মদিরাই হোক, আর হলাহল হোক – তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়।'[২৭]

ইউরোপের ভাবধারা ইংরেজ-ফরাসি-ওলন্দাজ-পর্তুগিজ প্রভৃতি জাতির মাধ্যমে ভারতবর্ষে পৌঁছায়। ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসা ইয়ং বেঙ্গল কিভাবে জাগ্রত হয়েছিল তার বিশদ পরিচয় সাহিত্যের ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইউরোপের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা কি তা থেকে ভিন্ন কিছু? প্রমথ চৌধুরী নিজের মধ্যে ধারণ করেছিলেন ইউরোপীয় বৈদগ্ধ্য ও কৃষ্ণনগরীয় আভিজাত্য। এক কথায় তিনি অন্ধ অনুকরণ নয়, সচেতন অনুসরণ এবং সতর্ক-সংযত প্রয়োগে বিশ্বাসী। স্মরণযোগ্য যে, মেঘনাদবধ কাব্য তাঁর বিবেচনায় 'পরগাছার ফুল' এবং 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' খাঁটি স্বদেশি হলেও তিনি পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধে উন্নতি দেখেননি, বরং উভয়ের মিলনের মধ্যে কল্যাণ দেখেছেন। তাঁর বক্তব্য : 'দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলার পতিত জমি সেই মিলন ক্ষেত্র হবে।'[২৮]

ধর্মজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

আধুনিক যুগে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ প্রকট হয়েছে। মধ্যযুগে ধর্মীয় জ্ঞানের অধীন ছিল বিজ্ঞানের জ্ঞান। কিন্তু আধুনিক যুগে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচ্ছদ ছিন্ন করে বিজ্ঞানের অভিযাত্রা বাধাহীনভাবে ঊর্ধ্বমুখী। বিজ্ঞান ও ধর্ম জীবনের দুটো দিক,
দু-রকমের জ্ঞান; দুটো জিজ্ঞাসা। ধর্মে রয়েছে কাল্পনিক বিশ্বাস, তন্ত্রমন্ত্র; বিজ্ঞানে রয়েছে নিরাবেগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাঁর মতে, 'বিজ্ঞান হচ্ছে পরীক্ষিত জ্ঞান।' তত্ত্বজ্ঞান অখণ্ড সত্যের ধারণা দেয়; তবে তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে বিজ্ঞানে গৃহীত হয় না। 'যারা মিথ্যাকে আঁকড়ে থাকতে চান তারাই কেবল বিজ্ঞানকে ডরান।' (প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্র. চ., পৃ ৫২)
বিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির জ্ঞান, অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যোগাযোগ করে সে-জ্ঞান পাওয়া যায়। সুতরাং কোনো একটি বিশেষ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড় করানো যায় না।[২৯]

তাঁর মতে, তত্ত্বজ্ঞানই ধর্মজ্ঞান। ধর্মীয় জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নেই। তার ভেতরে আছে কেবল বিশ্বাসের ভিত্তি। অনুভবের জগতে তার সত্যতা মেলে। প্রমথ চৌধুরী দাবি করেন, বিজ্ঞানের চর্চা করলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান মারা যাবে না; অর্থাৎ আমাদের ধর্ম নষ্ট হবে না। আমাদের বাক্যজ্ঞানও নষ্ট হবে না; অর্থাৎ কাব্য-শিল্পও মারা যাবে না। তাঁর মতে, 'যা তত্ত্বজ্ঞানও নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানও নয় তাই হচ্ছে যথার্থ মিথ্যা। তারই চর্চা করে আমরা ধর্ম সমাজ-কাব্য-শিল্প, এককথায় সমগ্রজীবন, সমূলে ধ্বংস করতে বসেছি।'[৩০]

বস্তুতন্ত্রতা ও কাব্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গ

কলাকৈবল্যবাদ আলোচনার মধ্যে বস্তুতন্ত্রতা বিষয়ে আলোচনা এসেছে। তবে প্রমথ চৌধুরী বিশেষ একটি কারণে 'বস্তুতন্ত্রতাবস্তু কী' শিরোনামে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একই সঙ্গে কাব্যে অশ্লীলতাও তাঁর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হিসেবে ধরা পড়ে এবং তিনি 'কাব্যে অশ্লীলতা ও আলংকারিক মত' শিরোনামের প্রবন্ধে নিজের অভিপ্রায় তুলে ধরেন। তাই উক্ত দুটো বিষয়ে আলাদা করে কিছু বলার সুযোগ রয়েছে। দুটো বিষয়েই তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে।

বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল প্রমুখ রবীন্দ্রসাহিত্যের বস্তুধর্মিতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার প্রতিক্রিয়ায় প্রমথ চৌধুরী 'বস্তুতন্ত্রতাবস্তু কী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

''বস্তুতন্ত্রতা' শব্দের মূল ধারণা সংস্কৃত থেকে নয়, এসেছে ইংরেজি 'রিয়ালিজম' শব্দ থেকে। তা বাংলা সাহিত্যে 'বস্তুতন্ত্রতা' অভিধা পেয়েছে। ইউরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে শব্দটি প্রথম আইডিয়ালিজমের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়।'[৩১] রাধাকমল বাবুর বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'বস্তুতন্ত্রতা' বস্তুর স্বরূপ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তার অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গত, তিনি ভিক্টর হুগোর সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় রচিত ফ্লবেয়ার প্রমুখের উল্লেখ করেন। 'তিনি বস্তুতন্ত্রতাকে ইংরেজি রিয়ালিজম শব্দটির তর্জমা হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। রোমান্টিক সাহিত্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়।'[৩২] ইউরোপে আইডিয়ালিজমের প্রতিক্রিয়ায় রিয়ালিজমের উদ্ভব। এটা তিনি উল্লেখ করেন এবং স্মরণ

করিয়ে দেন, রিয়ালিজম শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত।

আমরা অবগত যে, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মাধ্যমে একটা জগৎ নির্মাণ করেন। আইডিয়ালিজমের দিক থেকে তাকে অনেকে স্বর্গপুরী ভেবেছেন। রাধাকমল বাবুও তাঁদের একজন। তবে প্রমথ চৌধুরী মনে করেন, রবীন্দ্রসাহিত্য স্থান-কাল-দেশ বিচ্ছিন্ন নয়। সমগ্র জাতির হৃদয় থেকে তার রস সঞ্চারিত হয়েছে। সেটা অবাস্তব হতে পারে না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দেন যে, 'কোনো দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হয়।'[৩৩]

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা ব্যাখ্যার সূত্র ধরে 'যুগধর্ম' কথাটি তাঁর আলোচনায় এসেছে যা সাহিত্যে-শিল্পে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারকারী অনুষঙ্গ। কেননা, সাহিত্যে 'যুগধর্মের' প্রতিফল সম্পর্কিত ধারণা সমালোচকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। 'যুগধর্ম' ধারণ না করে যুগান্তরের বার্তা পরিবেশন করা কোনো সাহিত্যিকের জন্যে কষ্টকর। স্বকাল ও স্বসমাজের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে প্রতিভাবান লেখক হয়ে ওঠেন কালোত্তীর্ণ লেখক। সমকালের বাস্তবতা গ্রাহ্য না করে চিরকালের হয়ে ওঠা যায় না। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না, কালীদাসের কালের কথা স্মরণ না রাখলে মেঘদূত কাব্যের মূল্য বিচার যথাযথ হয় না। লেখকের সমগ্র সত্তাকে বুঝতে গেলে সমকালীন বাস্তবতার পাঠ অপরিহার্য। প্রমথ চৌধুরী কেবল সাহিত্যিক নন, সমালোচকও বটে। সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি বলেন, 'যুগধর্ম সাহিত্য ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হওয়া সাহিত্যের চরম সাধনা না হতে পারে; কিন্তু 'যুগধর্ম' বলে যে একটি বিশিষ্ট কাল লক্ষণ আছে তাকে বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।' তবে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে যুগধর্মের প্রতিফলন অপরিহার্য – এ-কথা প্রমথ চৌধুরীর গ্রাহ্য নয়। তাঁর যুক্তি – 'একই যুগে পরস্পরবিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়।' তাঁর মতে, 'যুগধর্মের উপর গুরুত্বারোপ না করলেও সাহিত্যের মান ও বৈশিষ্ট্য বিচারে একটা কালের ও সমাজের মৌলিক অভিপ্রায় ও অভিব্যক্তিকে স্বীকার করতে হয়।' এ-প্রবন্ধে রিয়ালিজমের স্বরূপ নির্ণয়, ফরাসি সাহিত্যে ভাববাদ ও বাস্তবাদের স্বরূপ এবং তার দ্বিপাক্ষিক – একদিকে বালজাক, অন্যদিকে এমিল জোলার প্রসঙ্গ এসেছে। চৌধুরী মহাশয় দুধারার কোনটির আতিশয্য সমর্থন করেননি। রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, সাহিত্যকে জীবন বিচ্ছিন্ন 'আকাশগঙ্গা' করে যেমন লাভ নেই, তেমনি নদর্মার পঙ্কিল প্রবাহের মধ্যে জোর করে টেনে এনেও কোন লাভ নেই।' এ-ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী সামগ্রিকভাবে বেশ সচেতন ছিলেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত, 'অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব – এ দুয়ের কোনটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুল নাচ এবং আইডিয়ালিমের ছায়াবাজি উভয়ে কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ।'[৩৪]

বস্তুতন্ত্রতা বস্তুর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে তিনি Art for art sake মতের উৎপত্তি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। 'একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই Art for art sake মতের উৎপত্তি হয়েছে।' বিশুদ্ধ আনন্দ পরিবেশন সাহিত্যকর্মের অন্যতম লক্ষ্য, তবে তা জীবনবিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে। একথা প্রমথ চৌধুরীর ভাবনার

বাইরে নয়। তিনি অবশ্য স্মরণ করিয়ে দেন, 'সাহিত্যকে কোন বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ করে তুললে তাকে সংকীর্ণ করে ফেলা হয়।'[৩৫]

বিশিষ্ট যুগের অধীন থেকেও সাহিত্যিক বা কবির মন একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস। 'কবির কার্য হচ্ছে সামাজিক মনকে সরস করা। কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদান প্রদানের সম্পর্ক আছে।' এ-কথা যিনি স্বীকার করেন, তাঁকে পুরোপুরি কলাকৈবল্যবাদী সাহিত্যিক হিসেবে আখ্যা দেওয়া কঠিন। 'যে সাহিত্য সমাজ বদলের দায়িত্ব নেয়, সেই রকম সাহিত্যে তাঁর ভাষায় শক্তি অনুরূপ শ্রী নেই।' আর্টের ভাগ কম হলে শেষ পর্যন্ত কালের সীমানা পেরিয়ে চিরকালের বার্তা বহনের যোগ্যতা তার থাকে না। এ-ব্যাপারে তাঁর অনুসিদ্ধান্ত – 'এই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট। কি বহিঃজগৎ, কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া কবির দৃষ্টি সাধারণ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে।'

প্রসঙ্গ অশ্লীলতা

যে-কোনো ভাষার অধিকাংশ কাব্যের বিষয় মানব-মানবীর প্রেম। অতএব কামলীলা বা রিরংসাবৃত্তি বর্ণনায় শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন নীতিগতভাবে উঠে আসে। কতটুকু অশ্লীলতা কাব্য পাঠকের জন্য মানানসই? রসোত্তীর্ণ কাব্যে অশ্লীলতা বলতে কি কোনো বিষয় নেই? সমাজ ও ধর্মের নীতিবোধ কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য কি না? কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে এগুলো মৌলিক প্রশ্ন এবং প্রমথ চৌধুরী সে-বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সংস্কৃত আলংকারিক বামন-এর ভাষ্যমতে, অশ্লীলতার স্বরূপ নির্ণয়ার্থে প্রথম চৌধুরী বলেন, 'যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয় সেই বাক্যই অশ্লীল।'

কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে প্রচুর বাদানুবাদ হয়ে আসছে। শৃঙ্গার রসের কাব্য রচনা করতে গিয়ে অতীতে ও সমকালে অনেকে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেন। প্রণয়ভাব মহৎ বিষয়, কিন্তু কাব্যের ছত্রে ছত্রে শৃঙ্গার রস পরিবেশন উদ্দেশ্যমূলক এবং তা গ্রাম্যতার পরিচয়বাহী। কেননা অশ্লীলতা এক ধরনের গ্রাম্যতা, যা কাব্যের অর্থগত মাধুর্য নষ্ট করে। আলংকারিকদের মতে, যা রসের প্রতিবন্ধক তাই দোষের এবং যেহেতু অশ্লীলতা বিশেষ রূপে রসের প্রতিবন্ধক সে কারণে তা কাব্যের বিশেষ দোষ। কাব্যে মাধুর্য ও অমাধুর্য সৃষ্টি হয় শব্দযোগে। সেই শব্দ সাধু ভাষা থেকে এসেছে, না ইতর ভাষা থেকে, তা বিবেচ্য। সাধু ও ইতর ভাষার মধ্যে প্রভেদ আছে। একসময় সাধু ভাষার রাজত্ব ছিল, তা ইতর ভাষা বা চলিত ভাষাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। কালের বিবর্তনে মানবজীবনে বহুকিছুর পরিবর্তন হয়; অনেককিছু উল্টে যায়। দ্বিধার কী আছে? যুগভেদে একই সমাজে রুচির পরিবর্তন ঘটে। এককালের অশ্লীলতা অন্যকালে লজ্জাকর নাও হতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'সাহিত্যের স্বাস্থ্য কথাটি সম্পূর্ণ নিরর্থক।' আসল কথা হচ্ছে বিচার করতে হবে যে, বাক্যটি রসের প্রতিবন্ধক হয়েছে কি না।

সামাজিক মন অশ্লীলতা দ্বারা বিব্রত হয়। তবে সামাজিক মন সব যুগে একই জায়গায় থাকে না। আবার একদেশে যা অশ্লীল, অন্য দেশে তা অশ্লীল নাও হতে পারে। প্রমথ চৌধুরী দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, 'আনাতোল ফ্রাঁসের কথা ইংরেজদের কাছে অশ্লীল ঠেকে।' কাব্যরসিকের কাছে দোষের ঠেকলে তাই দোষের। আলংকারিকদের মতে, 'অশ্লীলতা ও শ্লীলতার কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্যরসিক সমাজের রুচি।'[৩৬]

অশ্লীলতার অভিযোগে দেশে ও বিদেশে অনেক উপন্যাসকে নিষিদ্ধ করার ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেব বসুর রাতভরে বৃষ্টি, ডি এইচ লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লি'স লাভার ও লেভ তলস্তয়ের পুনরুজ্জীবন অশ্লীলতার দায়ে দণ্ডিত উপন্যাস। কবি শার্ল বোদলেয়ারের কাব্য থেকে ছয়টি কবিতাকে বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল এবং কবি ও প্রকাশক উভয়কে জরিমানা দিতে হয়েছিল। কিন্তু আজকে ওইসব উপন্যাস ও কাব্য স্ব-স্ব সমাজের মানুষের কাছে প্রতিদিনকার পঠিতব্য সামগ্রী।

কাব্যে অশ্লীলতা বিচার করতে গেলে ইথিকসের প্রসঙ্গ আসে। নীতিগতভাবে কুরুচিপূর্ণ কথা বা ভাবকে উন্নত ও মানসম্পন্ন কাব্যের অন্তর্গত করা যায় না। 'যে উক্তি মানুষের মরাল সেন্সকে পীড়িত করে তাও ছিলো তাঁদের মতে, কাব্যে বর্জনীয়।'

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য বিচার সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'সাহিত্য বিচারে চৌধুরী মহাশয় যেমন পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের মানদণ্ড প্রয়োগ করেছেন, তেমনি প্রাচ্য আলংকারিকদের সূত্রও অনুসরণ করেছেন। আলংকারিকদের সূত্রই শুধু নয়, আধুনিক সাহিত্যিকের ওপর এই বিধিগুলিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। টীকাকারদের মতো প্রাচীন আলংকারকদের সুতীক্ষè বিচার, অভ্রান্ত যুক্তি এবং গাঢ়-সংহত মিতাক্ষর বাক-বিধিকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন।'[৩৭]

প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য

'বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।' অতুলচন্দ্র গুপ্তের এ-মন্তব্য সূত্রে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ সাহিত্যকে উৎকর্ষের শীর্ষে উন্নীত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময়ে আরো যাঁরা প্রবন্ধ রচনায় সফলকাম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম।

ধর্মালোচনায় রামমোহন রায় প্রবন্ধের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সমাজসংস্কারমূলক তর্ক-বিতর্কেও বিদ্যাসাগর প্রবন্ধকাঠামো অবলম্বন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কারো প্রবন্ধে সাহিত্যগুণের অভাস মেলে না। কেননা সাহিত্যে বিশুদ্ধ মন ও মননের মুক্ত ভাবনা প্রকাশ নয়, বরং 'যুক্তির সঙ্গে নিষ্ঠার, চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের, সাহিত্যচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সমন্বয়' প্রবন্ধকে প্রকটভাবে বিষয়নির্ভর করেছিল। তাতে মুক্তচিন্তার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। তার প্রতিতুলনায় প্রমথ চৌধুরী 'নবীন উৎসাহ ও অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে সমগ্র বিশ্বসংস্কৃতি পরিভ্রমণের ক্লান্তিহীন আনন্দে উজ্জীবিত।

বিশ্ববীক্ষায় তৎপর মার্জিত পরিশীলিত রসিক মনের হাসির আলোকে উজ্জ্বল একটি প্রবন্ধলোকে আমরা উত্তীর্ণ হই প্রমথ প্রবন্ধাবলিতে।'[৩৮]

সংবাদপত্রের আশ্রয়ে বাংলা গদ্যের জন্ম ও বিকাশ এবং সে-কারণে সংবাদপত্র-আশ্রিত প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিচেতনার চেয়ে সামষ্টিক চেতনা প্রবল। 'এ অবস্থায় প্রমথ চৌধুরীর আগমন ব্যক্তিগত প্রবন্ধরীতি নিয়ে যা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্বাতন্ত্র্যে প্রখর এবং বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান। একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃজন করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ বা মিতালী স্থাপনের কৌশল বাংলা প্রবন্ধে এই প্রথম দেখা গেলো।'[৩৯]

অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহের ভূমিকায় বলেন, 'প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি নানা কষ্টিপাথরের বিচারে বাংলা সাহিত্যের বড় সম্পদ। প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আহ্বান, উপদেশে ও আচরণে। প্রাচীন ও নবীন সংস্কার অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির মনের এই মুক্তির বাণী প্রতিষ্ঠা হোক।' তিনি আরো বলেন, 'প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যে রচনারীতি এনেছেন বাংলা সাহিত্যে তা নূতন। যেসব প্রবন্ধ বিতর্কমূলক নয় তারও রচনারীতি নতুন।' নবযুগের বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম বাহন হয়ে উঠবে প্রবন্ধ। ঠিক এমন বিশ্বাস রেখে প্রমথ চৌধুরী নিজের ব্যক্তিত্বগুণ মিশিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। বিষয়ের বৈচিত্র্য ও ভাবের ঐশ্বর্যে প্রবন্ধের নিজস্বতা গঠিত হয়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা এখানে একটি কথা যোগ করতে পারি – বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীর মনও সত্যের বহুবিচিত্র ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, আর সে-মনের আলো পড়েছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। বঙ্কিমী প্রবন্ধ রীতি ও রবীন্দ্র প্রবন্ধরীতির সঙ্গে তুলনায় বীরবলী প্রবন্ধরীতির স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা যায়।'[৪০]

এই স্বাতন্ত্র্য মূল্যায়নের পটভূমিতে রয়েছেন বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্র। 'ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক এবং সামাজিক নকশা রচনায় ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কেজো গদ্যের গণ্ডি অতিক্রম করে বাক্যের গঠন কৌশলে দৈনন্দিন জীবনের 'ন্যায় বা লজিক' রক্ষায় উৎসাহী বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য।'

'বাক্যের যুক্তি পরম্পরাকে অতিক্রম করে বঙ্কিমী গদ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য এবং এই উত্তরাধিকার থেকেই গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের যাত্রা। প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাবের ফলে বাংলা গদ্যে জীবন ও সাহিত্যের পরম সন্নিপাত ঘটেছিলো বলা যেতে পারে। উনিশ শতকের পরে এই আরেকবার এবং শেষবারের মতো – সাহিত্যিক গদ্যের ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য আলোচনা। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসমূহ যেমন সৃজনশীল ও মননশীল যৌথ ধারায় পরম উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে, তেমনি তার গদ্যও সৃজনশীলতার শিখর স্পর্শ করে এবং পরবর্তী কিংবা পূর্ববর্তী কারো সাথে তুল্য নয়।'[৪১] এই অতুলনীয় প্রমথ চৌধুরীকে পরবর্তীকালে নবীন লেখকগণ কেন সফলভাবে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে পারলেন না তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রসঙ্গ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য গ্রন্থে নীলরতন সেন বলেন, 'প্রমথ চৌধুরী কিন্তু সাহিত্যের চিন্তাকে কোথাও এতটুকু জটিল করতে চান নি। এ যুগে সেদিক থেকে কেউ-ই খাঁটিভাবে প্রমথ চৌধুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। মধুসূদন যেমন এক যুগে সাহিত্যের রীতির দিক থেকে অনন্য ছিলেন, প্রমথ চৌধুরীও সেরূপ একক পথচারী

হয়েছেন। অক্ষম ব্যর্থ
দু-একজন অনুকারকের কথা বাদ দিলে তার বুদ্ধিদীপ্ত সহজ বলিষ্ঠ অথচ শ্লেষ প্রধান পাণ্ডিত্যে উজ্জ্বল কথা, বাচনভঙ্গি – চিন্তার স্বকীয়তা – আজও অনুকরণীয় রয়ে গেছে। এই গুণটি ঠিক বাঙালি মেজাজের সহজাত গুণ নয় বলেই সম্ভবত কেউ তাকে অনুকরণ করে উঠতে পারেন নি।'

সাহিত্যাদর্শ অনেক সাহিত্যিকের নিজস্ব জীবনাদর্শের প্রতিফলন। যুগের আবহে তার পরিপুষ্টি এবং অতীতের ঐতিহ্য দ্বারা তার গতি হয় নির্ধারিত। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যভাবনা বিশুদ্ধ, শৌখিন এবং আনন্দময় জগৎ নির্মাণে নিবেদিত ছিল। ফলে তাঁকে অনুসরণ করা পরবর্তীদের জন্যে খুব সহজ ছিল না। অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহের ভূমিকায় আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেন, 'সমকালে ও অনতিপূর্বকালে দুইজনের লেখা প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলির মূল্য ও বিশেষত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই দুইজন হচ্ছেন – রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যভাবনায় সমকালীন জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির নানাবিধ সমস্যা স্থান পেয়েছে এবং তাতে তৈরি হয়েছে সাহিত্যিক গদ্য। 'বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাত বাংলা গদ্যের ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়।'[৪২]

স্টাইল ও ভাষা প্রসঙ্গ – এক

স্টাইলের পরিচয় ঘটে বিষয়, চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে। কথায় বলে Style is the man – এ অর্থে প্রমথ চৌধুরী একজন স্টাইলিস্ট। একজন লেখক বা সাহিত্যিকের বিশেষত্ব তাঁর চিন্তার মৌলিকতায়, বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভাষার শৈল্পিক ব্যবহারে। জিবেন্দ্র সিংহ বলেন, 'প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রধান আকর্ষণ তার Style. তাঁর লেখা পড়লেই মনে হয় সেখানে আর কিছু না থাক, মৌলিকতা আছে।'[৪৩]

অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী হয়তো তিনি নন, তবে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। সমকালীন লেখকদের মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি রচনার সৌন্দর্য এবং নতুন কিছু বলার দৃঢ় মনোবল। তাঁর নিজের কথায় – আমার নিজের লেখার ভেতরে যে গুণ অথবা দোষ ছিল, আমার আজকের লেখার ভেতরেও সে গুণ ও দোষ আছে। আর সে বস্তুর নাম Individuality.'

লেখার বিষয়বস্তুতে ভাবগাম্ভীর্য বলতে যাই থাকুক, উপস্থাপন কৌশলে নিজস্বতা তৈরি না হলে পাঠকমনে দীর্ঘস্থায়ী রেখাপাত করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের প্রবন্ধে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ বাক্যগাঁথুনিকে যথেষ্ট দুর্বোধ্য করলেও জীবন উপলব্ধির গভীরতা, তুলনামূলক সাহিত্য বিচারে তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে স্বাতন্ত্র্য মহিমা দান করেছে। এটা বঙ্কিমীয় নিজস্বতা। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যায় না। একইভাবে সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরসের আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র, বা চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক তুলে ধরার মুন্সিয়ানা তাঁর সাহিত্য রীতি বা স্টাইল। নিজস্ব স্টাইল প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তন, নতুন

স্টাইলে উত্তরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা বাংলা সাহিত্যে তুলনাহীন। স্টাইলের দিক থেকে তিনি বারবার নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন যা তাঁর পাঠককে বিদ্যুচ্চমকের মতো সম্মোহিত করছে। উপমার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ তাঁকে সুনিপুণ শিল্পীর কর্তৃত্ব দিয়েছিল। সাহিত্যে এ-ধরনের নিজস্বতা নির্মাণে প্রমথ চৌধুরী প্রথম থেকে নিজের মতোই একজন সফল শিল্পী।

প্রমথ চৌধুরীর মনের ধাত ও সাহিত্যিক মেজাজের মধ্যে একটা অনন্যতা আছে, অনন্যতা আছে চিন্তানুভূতির প্রণালির মধ্যেও। তাঁর স্টাইল তৈরি হয়েছে মনোরাজ্যের বিষয়াদি নিয়ে। সাহিত্যের সঙ্গে মনের সম্পর্ক মূল্যায়ন তাঁর কাছে বিশেষ স্থান পেয়েছে। তাঁর মনের প্রবণতা ছিল বিচিত্রমুখী। জ্ঞান সাধনা ও অন্তর্ভেদী রূপ বিশ্লেষণই তাঁর জীবনের প্রধান নেশা ছিল। সাহিত্য আড্ডায় জমিয়ে বসা এবং বিচারকের সামনে বাদী ও বিবাদীর তর্ক-যুক্তি মারপ্যাঁচ দিয়ে সত্য উদ্ঘাটন এবং উপস্থাপন প্রমথ চৌধুরীর নিজস্বতারই প্রতিফলন। যে গুণ রবীন্দ্রনাথকে প্রমথ চৌধুরীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তা হলো তাঁর নিজস্বতা বা Individuality। চিন্তানুভূতি প্রকাশে নিজস্ব ধরন। সেই ধরনের মধ্যে ছিল অনায়াস যুক্তির শৃঙ্খলা বা Logical Sequence। পাঠক তা উপলব্ধি করেন। জিবেন্দ্র সিংহের মতে, প্রমথ চৌধুরীর রচনার স্টাইলের অন্যতম রহস্য এখানে। তাঁর মতে, প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-গঠন পরিপাট্য অনবদ্য। গদ্য তাঁর অতরল ও মেদহীন। অপ্রয়োজনীয় বিশেষণ ব্যবহারের ঝোঁক নেই। বস্তুত কারুকার্য খচিত চকচকে বাক্য সেখানে আটপৌরে শব্দ সহসা স্থান করে নিয়েছে বক্তব্য স্পষ্ট করার লক্ষ্যে।

দৃষ্টান্ত : ১. ছবি 'ফাউ' দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয় দেওয়াটা আধুনিক ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ)

২. জয়দেবের উপমাসকল প্রায়ই নেহাত পড়ে পাওয়া 'গোছের'। (জয়দেব)

৩. কাজেই রাধা 'ঠাহরাইলেন' যে কৃষ্ণ অন্য কোনো রমণীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার সহিত 'জমিয়া' গিয়াছেন। (জয়দেব)

৪. এ রোগের ওষুধ কি, বলা কঠিন অন্তত ওর কোনো 'টোটকা' আমার জানা নাই। (সাহিত্য সম্মিলন)

প্রমথ চৌধুরীর স্টাইলের মধ্যে ভাষা ব্যবহার এবং ভাষার মাধ্যমে Paradox সৃষ্টি অন্তর্গত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থে এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জিবেন্দ্র সিংহ বলেন, প্রমথ চৌধুরীর এই প্যারাডক্স প্রিয়তার কারণ দুটি – একটি সামাজিক, অন্যটি সাহিত্যিক। এই প্যারাডক্সের মাধ্যমে সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির নিদ্রালু মনকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। 'আর সাহিত্যিক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন হাস্যরসের পূজারী। প্যারাডক্স হাস্যরস বা রিঃ সৃষ্টির একটা প্রকৃত উপায়। তাই প্যারাডক্স রচনায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিলো।'[৪৪]

প্রবন্ধ গদ্যের নির্মাণ। গদ্যই প্রবন্ধের আঙ্গিক বা কাঠামো তৈরি করে। সেই গদ্যে ছোট বাক্য লেখা হয়। ভাব ও বক্তব্যের সঙ্গে তাল রেখে বাক্যের গঠনশৈলীর মধ্যে কথার স্রোত তৈরি হয়, সৃষ্টি হয় গদ্যছন্দের। ছন্দময় গদ্যের প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে লক্ষণীয়।

দৃষ্টান্ত ১. ছোটগল্প, খণ্ড কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। (বর্তমান বঙ্গসাহিত্য)

২. তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার, অতএব তা সংক্ষিপ্ত। (বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য)

৩. অপর পক্ষে নবযুগের ধর্ম হচ্ছে, মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা, কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকে ছাড়তে দেওয়া নয়। (বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ)

২

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্র (১৯১৪) পত্রিকার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা আলোপাত করা হয়েছে। তথাপি সবুজপত্র পত্রিকার সূত্র ধরে প্রমথ চৌধুরীর ভাষাদর্শ বিষয়ে আর কিছু আলোচনার সুযোগ রয়েছে তাঁর অবলম্বিত চলিত ভাষা প্রসঙ্গে। বঙ্কিমযুগে কথাভাষাকে সাহিত্য রচনার ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৭) ও হুতুম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬২)। বঙ্কিমচন্দ্র এ-যুগের ভাষা সমস্যার উপর আলোকপাত করেন।

সংস্কৃতবহুল গদ্য বা আঞ্চলিক কথ্য শব্দবহুল গদ্য – কোনোটির পক্ষপাতিত্ব না করে বঙ্কিমচন্দ্র বিবদমান দুপক্ষের উদ্দেশে বলেন, 'বিষয়ানুসারে ভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত।' ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতার জন্যে তিনি যে-কোনো শ্রেণির শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন। অন্যদিকে পরবর্তীকালে সাধুভাষা ও কথ্যভাষার বিতর্কে না গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিচিত্র রচনাবলির মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি, ছিন্নপত্র, শান্তিনিকেতন পর্যায়ের প্রবন্ধাবলি চলিত ভাষায় লেখা। ঘরে-বাইরে উপন্যাস তিনি চলিত ভাষায় রচনা করেন। মধুসূদনের নাটকে, বিশেষত তাঁর প্রহসনে এবং দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে রচিত সংলাপের ভাষা চলিত। তবে এগুলো বিচ্ছিন্ন প্রয়াস, কোনো সম্মিলিত আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ নয়।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদাদানের চেষ্টা যে চৌধুরী মহাশয় সর্বপ্রথম করেছেন এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য না হলেও তিনিই যে এই ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'[৪৫]

এ-আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের মতো একজন অসাধারণ শিল্পীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। ফলে প্রমথ চৌধুরীর কাজটি অনেকাংশে সহজতর হয়েছিল, যদিও তাঁর বিপক্ষে সমালোচকের অভাব ছিল না। প্রমথ চৌধুরী কথ্যভাষার পোষকতা করতে গিয়ে যে গদ্যরীতি নিজের লেখায় অনুসরণ করলেন তার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর অনুসৃত গদ্যরীতি 'বীরবলীয়' গদ্য নামে পরিচিত। 'বীরবলীয় ঢঙে দীপ্তি ও দাহ সমভাবে

বিদ্যমান। বুদ্ধির খেলা, শব্দের চতুর প্রয়োগ, শ্লেষ বক্রোক্তি-বিরোধাভাসের নিপুণ বিন্যাস বীরবলীয় গদ্যরীতিকে অনন্যতা দিয়েছে।' 'মেদহীন বাক্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার দুর্নিরীক্ষ্য এবং নাগরিক বৈদগ্ধ্য চিহ্নিত উচ্চারণ অলংকারমণ্ডিত।' কিন্তু আলংকারিকতা বীরবলের গদ্যকে সর্বত্র সুন্দর করেনি। মনে রাখা চাই, রচনার প্রধান গুণ স্পষ্টতা। তাই বাক্যকে অলংকৃত না করে নিরলঙ্কার রাখলেই স্থান বিশেষে অর্থ ভাল বোঝা যায়। প্রমথ চৌধুরী সর্বদা সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন কিনা সন্দেহ।[৪৬]

উপসংহার

গীতধর্মী নয়, ভাস্কর্যধর্মী, ভাবাবেগমুক্ত ঋজু সংহত আতিশয্যবর্জিত গদ্যরীতি যা প্রমথ চৌধুরীর প্রধান পরিচয় তা যে জনসাধরণের সহজ ভাষা সেটা সংশয়হীনভাবে দাবি করা চলে না। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, 'সাধারণের কথ্যভাষা আমার লেখনীতে ফোটে নি, আমার এ ভাষাও কৃত্রিম।'[৪৭] সাধুভাষা কৃত্রিম ভাষা, একথা যেমন সত্য, তেমনি প্রমথ চৌধুরী অনুসৃত গদ্যরীতিতে ব্যবহৃত চলিত রীতিটিও কৃত্রিম। কেননা দৈনন্দিন আটপৌরে জীবনের কিছু শব্দ যেমন 'ঠাহরাইলেন' 'পড়ে পাওয়া গোছের' পিছলাইয়া' 'ফাউ' 'টোটকা' 'জুড়িতে জোতা' 'খোরপোশ' 'আঁকুবাঁকু' 'ছাঁকা' 'সাচ্চা' 'খন্তা' 'কোদাল' 'আবডালে' ইত্যাদির নিপুণ ব্যবহার ছাড়া সাধারণের কথ্যভাষারীতির পরিচয় তেমনটা সুলভ নয়। উল্লেখ্য যে, তাঁর সম্পাদিত সবুজপত্রবাহিত গদ্যের বিরুদ্ধে তখন যাঁরা সমালোচনামুখর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর সমালোচনার সারবত্তা একেবারে উপেক্ষণীয় নয় – এমন মন্তব্য করেছেন রথীন্দ্রনাথ রায়। মোহিতলালের কথা, 'গদ্যে যাহারা চলিত ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িয়া তুলিল। সমাজের এক সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায়, কৃত্রিম স্বরভঙ্গিতে আধো আধো টানাটানা উচ্চারণে যে ধরনের কথাবার্তা হয়, ইহা সেই ভাষা, ইহাতে 'ককনি' উচ্চারণযুক্ত, 'ককনি' বুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনি ইহা বাঙালি সন্তানের মুখের বুলিও নহে।'[৪৮] যে-ভাষা বাঙালি সন্তানের মুখে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হয় সেই ভাষা থেকে প্রমথ চৌধুরীর ভাষা অনেকখানি স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যের কারণ তাঁর মানসিক শক্তি, পরিমার্জনা ও স্টাইল। একটু পরখ করলে দেখা যায় যে, এ গদ্যও সাধনালব্ধ, সুমার্জিত এবং অতিসযত্নলালিত এবং সে-কারণে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর অনুসরণকারীদের সংখ্যা নগণ্য। তবে একথা বলা চলে যে, বাংলাভাষার বিশ শতকীয় প্রবাহে প্রমথ চৌধুরী একজন ভাষাশিল্পী, প্রাজ্ঞ আলংকারিক। সর্বত্র তাঁর বক্তব্য স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত, পরিশীলিত, শাণিত, সুগভীর এবং শিল্পিত ভাষ্যে সমুজ্জ্বল।